একক ৮ □ চাঁদবণিকের পালা

পর্যায় ৩ একক ৮

৮.০ প্রস্তাবনা
৮.১ শম্ভু মিত্র ও বাংলা থিয়েটার
৮.২ চাঁদবণিকের পালা : উৎস সন্ধানে
৮.৩ চাঁদবণিকের পালা : সারাংশ
৮.৪ চাঁদবণিকের পালা : আধুনিক রূপায়ণ
৮.৫ চাঁদবণিকের পালা : তত্ত্বানুসন্ধান
৮.৬ চাঁদবণিকের পালা : চরিত্র বিচার
৮.৭ অনুশীলনী
৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৮.০ প্রস্তাবনা

আধুনিক বাংলা নাট্যমঞ্চের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্র রচিত 'চাঁদবণিকের পালা' সর্বার্থেই এক অনন্যসাধারণ নাটক। রবীন্দ্রনাথ, ইবসেন, সফোক্লেস এবং আধুনিক নাট্যপরিক্রমার শেষে শম্ভু মিত্র পৌঁছে গেলেন এক মধ্যযুগের কাহিনি-নির্ভর সৃজনে—তার নাম 'চাঁদবণিকের পালা'। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, যে শম্ভু মিত্র বাংলা নাট্যমঞ্চে সর্বার্থে আধুনিক মন ও মননের দাবিদার, যিনি প্রথম বাংলা নাট্যমঞ্চে রবীন্দ্রনাথকে সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন, যিনি অত্যন্ত অনায়াস ভঙ্গিমায় ইবসেন, সফোক্লেসকে বাঙালির অন্তরে প্রোথিত করে দিতে পারেন—সেই শম্ভু মিত্র কেনই বা জীবনের সায়াহ্নে মধ্যযুগে—মনসামঙ্গল আকৃষ্ট হলেন? এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ও বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হবো আমরা।

৮.১ শম্ভু মিত্র ও বাংলা থিয়েটার

আমরা একথা জানি যে চল্লিশের দশকে যে 'শম্ভু মিত্র' একটি নামমাত্র, পঞ্চাশের দশকে সেই নাম একাই একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত। সেই সময় শম্ভু মিত্রের নিজের হাতে নির্মিত 'বহুরূপী' এবং 'শম্ভু মিত্র' সমার্থক। ঊনত্রিশ বছরের যুবক, যাঁর নাম শম্ভু মিত্র, তিনি নাটককে ভালোবেসে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' নাটক নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। বস্তুত সেদিনের সেই তরুণ শম্ভু মিত্র 'নবান্ন' নাটকে যে 'আবেগ-নিঃসঙ্গতা-ভালোবাসা' মিশ্রিত কাব্যিক আবহ নির্মাণ করেছিলেন—পরবর্তীকালে সেই কাব্যরসসিক্ত সৃজন তাঁরই নির্দেশনায় নানা নাটকে আমরা লক্ষ্য করেছি। বস্তুত পরিচালক বা নির্দেশক হিসেবে 'রিয়েলিটি'-র গভীরতাসন্ধানে শম্ভু মিত্রের ছিল সযত্ন-সতর্ক অভিনিবেশ। এই কারণেই আমরা লক্ষ্য করি যে আর পাঁচজনের কাছে 'নবান্ন' নাটকের হাহাকার

যখন মুখ্য ; তখন শম্ভু মিত্রের কাছে নবান্ন-র হাহাকার বড় কথা নয়। 'নবান্ন' এক গভীরতর বেদনার কাব্য এই বোধে-ই উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন শম্ভু মিত্র। ভারতীয় গণনাট্যসংঘের প্রযোজনায় 'নবান্ন'-র অভিনয় সে ইতিহাস সৃষ্টি করলো, তারই ধারাপথে পরিচালক শম্ভু মিত্র অনিবার্যভাবেই এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলেন।

আমরা একথাও ভুলে যেতে পারি না যে চল্লিশের দশকে পেশাদার থিয়েটারে যোগ দিয়েও শম্ভু মিত্র সেখান থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। কিন্তু, কেন? বস্তুত কোনো এক গভীরতর অতৃপ্তি তাঁকে যেন ভেতর থেকে 'অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে' এই উচ্চারণে অস্থির করে তুলেছিল। তাই ভারতীয় গণনাট্যসংঘে শম্ভু মিত্রের যোগদান ও 'নবান্ন' নাটকের মঞ্চায়ন বাংলা নাটকের জগতে তৈরি করেছিল নতুন প্রয়োগ নৈপুণ্যের পথনির্দেশ। ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ এই সংক্ষিপ্ত পর্বে গঠিত হবার মতন স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করলো ভারতীয় গণনাট্যসংঘ। আর তার মধ্যমণি হিসেবে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হলেন শম্ভু মিত্র।

উপরোক্ত প্রেক্ষিতে শম্ভু মিত্রের নতুন জীবন, বলা ভালো নাট্যজীবন শুরু হলো 'বহুরূপী' প্রতিষ্ঠায়। প্রতিষ্ঠার কয়েকবছরের মধ্যেই 'পথিক', 'উলুখাগড়া', 'ছেঁড়া তার' ও 'চার অধ্যায়' বাংলা থিয়েটারে নতুন দিকনির্দেশ করে দিল। এই প্রসঙ্গে 'বহুরূপী' প্রতিষ্ঠা পর্বের দেশ ও কাল বিশেষভাবে স্মরণীয়। বস্তুত বাংলা নাটকে পৌরাণিক, আধা-ঐতিহাসিক, মেলোড্রামাটিক পারিবারিক আবেগ সর্বস্বতা ইত্যাদি যে গতানুগতিক নাট্যভাবনার রূপায়ণ চলে আসছিল—হঠাৎ যেন এক লহমায় সমসাময়িক জীবন ও জীবনসংগ্রামের উপস্থাপনায় বাংলা নাটক অন্যরূপে উপস্থিত হল।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে শম্ভু মিত্রের হাত ধরে 'বহুরূপী'-র প্রতিষ্ঠা। দেশ তখন সদ্য স্বাধীনতা পেয়েছে,—সাম্প্রদায়িক হানাহানির উত্তপ্ত বাতাস তখনও মিলিয়ে যায়নি। উদ্বাস্তু সমস্যা দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে তৈরি করেছে এক নতুন সঙ্কট। এমনই এক অদ্ভুত কঠিন পরিস্থিতিতে শম্ভু মিত্র বাংলা নাটকে নতুন বাতাস এনে দিলেন।

বাংলা নাটকের অভিনয়ের ইতিহাসে শম্ভু মিত্র প্রথম পরিচালক ও অভিনেতা যিনি বাংলাভাষার কথ্যরূপকে সফলভাবে মঞ্চে নিয়ে এলেন। শম্ভু মিত্র প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন যে নাকটকটা দুই তরবারির খেলায় বা বিপরীত চাপে নির্মিত হয় না;—বরং বাঙালির একত্র কথোপকথন, বিভিন্ন কথ্যভঙ্গিমা, গতিভঙ্গিতে তৈরি হয় বাংলা নাটক। বাঙালির উচ্চারণের এমন নাটকীয় বৈচিত্র্য শম্ভুবাবুর পূর্বে বাংলামঞ্চে কেউ আমাদের এমন স্পষ্টাকারে দেখাতে পারেননি। শুধু তাই নয়, এতদিনের অভ্যস্ত ভঙ্গিতে আমরা যে রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংলাপ ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারিনি ; তা অবিশ্বাস্যভাবে বাঙ্ময় হয়ে উঠল শম্ভু মিত্র নির্দেশিত-অভিনীত-উচ্চারিত 'বহুরূপী'-র রবীন্দ্র নাটক প্রযোজনায়। রবীন্দ্র নাটক অভিনয়যোগ্য নয় এমন প্রচলিত ধারণাকে শম্ভভু মিত্র নস্যাৎ করলেন নিজস্ব দক্ষতায়। রবীন্দ্র নাটক ছাড়াও ইবসেন, সোফোক্লেসকে বাঙালি মন ও মননের আলোতে এমনভাবে নির্মাণ ও মঞ্চস্থ করলেন যে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হলাম।

নাট্যপরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে শম্ভু মিত্রের খ্যাতি ও বাংলা থিয়েটারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এহেন শম্ভু মিত্রকে আমরা নাট্যকার রূপেও লক্ষ্য করি। অন্য নাটকের অনুবাদকর্মে তাঁর সফলতাও লক্ষ্যণীয়। ইবসেন-এর 'ডলস্ হাউস'-এর অনুবাদ 'পুতুলখেলা', 'এনিমি অফ দ্য পিপ্‌ল'-এর অনুবাদ 'দশচক্র', সোফোক্লেসের 'কিং ঈডিপাস'-এর অনুবাদ 'রাজা অয়াদিপাউস' এবং ইউজিন ও নীল-এর নাটক 'হোয়্যার দা ক্রস ইজ মেড'-এর অনুবাদ 'স্বপ্ন',—বস্তুত শম্ভু মিত্রের অনুবাদ ক্ষমতার অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

নাট্যকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের নাট্যরূপ দান শম্ভু মিত্রর বিশেষকর্ম হিসেবে আজও চিহ্নিত হয়ে আছে। মৌলিক নাটকও উপহার দিয়েছেন তিনি। সেগুলি হলো : 'উলুখাগড়া', 'একটি দৃশ্য', 'বিভাব', 'কাঞ্চনরঙ্গা',

‘গর্ভবতী বর্তমান’, ‘ঘূর্ণি’, ‘অতুলনীয় সংবাদ’ এবং আমাদের আলোচ্য ‘চাঁদবণিকের পালা’।

৮.২ চাঁদবণিকের পালা : উৎস সন্ধানে

আমরা পূর্বেই একথা বলেছি যে নাট্যপরিচালনা ও অভিনয়ের জগতে কিংবদন্তী মানুষ শম্ভু মিত্র নাট্যরচনাকর্মে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছিলেন। ‘উলুখাগড়া’ বা ‘পুতুলখেলা’-র রূপান্তর, ‘রাজা অয়াদিপাউস’-এর অনুবাদ ইত্যাদি কর্মে শম্ভু মিত্রর অন্য এক সৃজনক্ষমতা আমরা লক্ষ্য করেছি।

আমাদের আলোচ্য ‘চাঁদবণিকের পালা’ এক আশ্চর্য সুন্দর সৃষ্টি! আমরা একথা জানি যে রবীন্দ্রনাটকের ‘রাজা’-র মহড়া-র সময়েই মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগর চরিত্রের ভাবনা শম্ভু মিত্রকে ঘিরে ধরেছিল। আমরা একথা জানি যে পুরাণ এবং ইতিহাসের কাহিনি অবলম্বন করে সাহিত্য রচনা আধুনিক সাহিত্যের বিশিষ্ট দিক। কিন্তু, মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আধুনিক সময়ের শিল্পীরা পুরাণে বা ইতিহাসে ফিরে যান কেন? এই ফিরে যাওয়া কী নিছক ঐতিহ্যের অনুবর্তন? আমাদের মনে হয়, পুরাণ বা ইতিহাসের চেনা ছবির মাধ্যমে আধুনিক সময়ের জীবন ও জীবনের জটিলতা বা সংকটকে রূপদানের প্রাথমিক ইচ্ছে থেকেই আধুনিক শিল্পীদের পুরাণ বা ইতিহাসে ফিরে যাওয়া। পুরাণ কাহিনি বা ইতিহাসের আধুনিকীকরণ ঘটে, নতুন নতুন মাত্রা ও ব্যঞ্জনায় পুরাণ বা ইতিহাস ধরা দেয়।

আধুনিক সময়ের নাট্যকার শম্ভু মিত্র তাঁর ‘চাঁদবণিকের পালা’ নাটকটির নির্মাণকল্পে যখন মধ্যযুগের সাহিত্য মনসামঙ্গল পৌঁছে যান,—তখন আমরা অনুভব করি যে, নিশ্চিতভাবেই শম্ভু মিত্র-র এই মনসামঙ্গাল, বিশেষত চাঁদসদাগরে পৌঁছে যাওয়া দীর্ঘদিনের চিন্তালালিত কোনো পরিকল্পনার-ই অঙ্গ। আমাদের পরিচিত মনসামঙ্গালের কাহিনিতে চাঁদসদাগর একজন গোঁয়ার, অহংসর্বস্ব, ব্যবসায়ীমাত্র। যার একগুঁয়ে, জেদি মনোভাবে পরিবার বিপর্যস্ত, ধ্বংসের মুখোমুখি সকলে। তবু চাঁদসদাগর, যে শিবের উপাসক, সে কোনোক্রমেই মনসার পুজো দিতে নারাজ। আপন প্রতিজ্ঞায় অটল সেই চাঁদসদাগর চরিত্র আধুনিক সময়ের নাট্যকার শম্ভু মিত্রকে বিশেষভাবে ভাবিয়েছিল। শম্ভু মিত্র মনসামঙ্গালের চাঁদসদাগর চরিত্রের মধ্যে এক বিস্ফোরক সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিলেন। মনসামঙ্গাল বর্ণিত ও মনসামঙ্গালের রচয়িতাদের কলমে উল্লেখিত জেদি, গোঁয়ার, অহঙ্কারী চাঁদসদাগর চরিত্রের মধ্যে বস্তুত শম্ভু মিত্র খুঁজে পেয়েছিলেন অন্যতর এক ব্যঞ্জনা,—আজকের কবির ভাষায় যে চাঁদসদাগর ‘আপন মুদ্রাদোষে, সকলের মাঝে বসে হতেছে আলাদা’! নাট্যকার শম্ভু মিত্রের মনে হয়েছিল, মধ্যযুগে মনসামঙ্গালে চাঁদসদাগরের জীবনে যে সংকট নেমে এসেছিল, সেই সংকটের মূলে আছে ব্যক্তিত্বের সংকট, আপন আদর্শে বিশ্বাসে অটল ব্যক্তিত্বের সংকট! আজও, আধুনিক সময়েও সেই সংকট বর্তমান। সেই সংকটের চেহারা হয়তো বদলে গেছে, সংকটের রূপ ও মাত্রা একইরকম নয়,—কিন্তু শম্ভু মিত্র-র মনে হয়েছে সেই সংকট আজও রয়ে গেছে। তাই আধুনিক সময়ে, আধুনিক জীবনে আপন আদর্শে-বিশ্বাসে অটল ব্যক্তিত্বের নিদারুণ সংকটের চিত্ররূপায়ণের নাট্যকার শম্ভু মিত্র মনসামঙ্গালের কাহিনি-নির্ভর চাঁদসদাগর চরিত্র নির্বাচনে আগ্রহী হলেন,—সেই কারণে শম্ভু মিত্রের নাটকের শিরোনাম ‘চাঁদবণিকের পালা’।

৮.৩ চাঁদবণিকের পালা : সারাংশ

নাট্যকার শম্ভু মিত্র-র ‘চাঁদবণিকের পালা’ নাটকের মূল উৎস মধ্যযুগের ‘মনসামঙ্গাল’ হলেও নাট্যকার কাহিনি নির্মাণে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতার স্বাক্ষর রেখেছেন। নাট্যকার শম্ভু মিত্র আলোচ্য নাটকে তাঁর দৃষ্টি যে সম্পূর্ণত চাঁদবণিকের

প্রতি এই কথা প্রমাণের জন্য 'মনসামঙ্গল'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র 'দেবীমনসা'-কে এ নাটকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন। তৎসহ বর্জিত হয়েছে মনসামঙ্গলের আর এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র 'নেতা ধোপানি'।

'চাঁদবণিকের পালা' নাটকটি শুরু হচ্ছে চাঁদবণিকের বাণিজ্যযাত্রার প্রস্তুতিতে। এই দৃশ্য নির্মাণে নাট্যকার প্রথমেই স্পষ্ট করে দেন যে চাঁদবণিক অপরাপর বাণিজ্যযাত্রীদের নেতা,—নেতৃত্বদায়ী অগ্রপথিক। এহেন সূচনার পরই নাট্য ঘটনার ঘনঘটা। চাঁদের সহযাত্রীদের মধ্যে মনসা-র ভীতি, প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির ভয়ঙ্করতার জন্য দ্বিধা-দুর্বলতা ক্রমশ যতই প্রকট হয়ে ওঠে,—ততই চাঁদবণিকের লড়াই তীব্রতর হয়। আরাধ্য শিবের উপাসক হিসেবে চাঁদবণিক বাণিজ্যযাত্রার যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়েও ক্রমশ সঙ্গীহীন হয়ে পড়ে। আধুনিক সময়ের প্রেক্ষিতে অদৃশ্যে দেবীমনসা,—তার প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে বেণীনন্দন, চাঁদবণিকের বাণিজ্যযাত্রার যাবতীয় পরিকল্পনা বিপর্যস্ত করে দিতে চায়। নাট্যকার এই প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির ভয়ঙ্করতা বোঝানোর জন্য নির্মাণ করেন এক অভিনব চরিত্র। যাঁর নাম আচার্য বল্লভ। এই আচার্য বল্লভ চাঁদের শিক্ষাগুরু। কিন্তু তিনিও পারিবারিক কারণে অনন্যোপায়চিত্তে আপোষে বাধ্য হন। চাঁদের সংকট ও অসহায়তা আরো তীব্র হয়ে ওঠে। আলোচ্য নাটকে অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে লখিন্দর-বেহুলা ও সনকা চরিত্র-ত্রয়। লখিন্দর বাবা চাঁদবণিককে প্রথমে ভুল বোঝে। সে ভাবে, বুঝি বাবার জন্যই তাদের পরিবারে নেমে এসেছে এমন বিপর্যয় ; তাই অক্লেশে বাবাকে ব্যঙ্গ করে সে বলতে পারে, "নাটুয়ার রাজার মতন রাজা সেজ্যে ভাব্যাছিলে সত্য বুঝি রাজা হয়্যা গ্যাছো"!

এহেন লখিন্দরের ক্রমশ পরিবর্তনও সম্পূর্ণ অভিনব। তার এই পরিবর্তনের মূলে বেহুলা। বেহুলা চরিত্রটি নাট্যকার সম্পূর্ণভাবে আধুনিক নারীরূপে চিত্রিত করেছেন। বেহুলা এই নাটকের একমাত্র চরিত্র যে প্রথমাবধি তার শ্বশুর চাঁদবণিকের আদর্শ কর্ম সম্পর্কে দ্বিধাহীনভাবে সশ্রদ্ধ। তারই প্রভাবে লখিন্দরের জীবনে পরিবর্তন আসে।

অন্যদিকে সনকা যেন আমাদের বাঙালি পরিবারের সাধারণ জননী ও গৃহবধূর চিত্র। সাংসারিক মঙ্গল কামনায় সনকা তাই স্বামীর অগোচরে মনসাকে পুজো করে।

প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির ভয়ঙ্করতা থেকে রেহাই পায় না চাঁদবণিকের বাণিজ্য ডিঙ্গি। চাঁদের পুত্র লখিন্দরকে সর্পদংশনে মৃত্যুবরণ করতে হয়। পুরাণ অনুসরণে বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে যাত্রা করে। অবশেষে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনে বেহুলা এই শর্তে যে তার শ্বশুর চাঁদবণিক মনসার পুজো দেবে।

এরপরই নাট্যকার সম্পূর্ণ অভিনব উপায়ে এমন এক দৃশ্য নির্মাণ করেছেন যা অভাবনীয় ও সম্পূর্ণ আধুনিক চেতনাসম্পন্ন। লখিন্দর-বেহুলা-র আত্মহত্যার দৃশ্য আলোচ্য নাটকে অসাধারণ মাত্রা যোজনা করেছে। পঙ্কিল-কর্দমাক্ত-নীতিহীন-আদর্শহীন সমাজে বাঁচা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় এবং মৃত্যুর অধিকার তথা আত্মহত্যা-র অধিকার ঘোষণার মধ্য দিয়ে নাট্যকার এ নাটকে যে করুণ আবহ তৈরি করেন তা অতুলনীয়।

সব হারিয়ে চাঁদবণিক কিন্তু শেষপর্যন্ত রিক্ত চিত্তে গ্লানিপূর্ণ হৃদয়ে যাত্রার প্রস্তুতিতে পুনর্বার মনোযোগী হয়। এভাবেই একজন ব্যক্তিস্বাধীনতাপ্রিয়, আদর্শবাদী, সত্যনিষ্ঠ মানুষের লড়াইয়ের কাহিনির সমাপ্তি ঘটে।

৮.৪ চাঁদবণিকের পালা : আধুনিক রূপায়ণ

মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যে মনসামঙ্গালের কবি দেবী মনসার মাহাত্ম্য প্রচারে-ই সর্বাধিক মনোযোগী ছিলেন। দেবী মনসার প্রতি ভক্তি নিবেদনে জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা এই বাণী-ই মনসামঙ্গালকাব্যে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত। স্বাভাবিকভাবেই দৈব মহিমা যে কাব্যের মূল অবলম্বন এবং দেবী মনসার মাহাত্ম্য প্রচার যে কবির মুখ্যকর্ম,—সেক্ষেত্রে অন্য ঘটনা ও অন্য চরিত্র তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীন হয়ে যায় সেকথা বলাইবাহুল্য। মধ্যযুগের যুগরুচি ও প্রতিবেশ

এমন এক দৈবমহিমাযুক্ত কাব্যরচনার অনুকূল ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর একজন প্রথিতযশা নট-নাট্যকার-পরিচালক যখন মধ্যযুগের সেই কাহিনিকে অবলম্বন করেন, তখন আমাদের মধ্যে ঔৎসুক্য জাগে। আমরা আকুল আগ্রহে লক্ষ্য করতে চাই যে শম্ভু মিত্রের মতন আধুনিক জীবনবোধসম্পন্ন একজন নাট্যব্যক্তিত্ব আধুনিক সময়ে মনসামঙ্গলের কাহিনিকে কীভাবে রূপদান করেন!

আমরা পূর্বেই একথা বলেছি যে শম্ভু মিত্র তাঁর 'চাঁদবণিকের পালা' রচনায় মনসামঙ্গলকে অবলম্বন করলেও মূলত তিনি মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগর চরিত্র সম্পর্কেই সবিশেষ আগ্রহী ছিলেন। শম্ভু মিত্র মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগর চরিত্রে যেটুকু লড়াই, আপোষহীন মনোভঙ্গিমা, আপন আদর্শে অটল থাকার ইচ্ছা লক্ষ্য করেছিলেন—তাকেই আধুনিক সময়ে একজন সত্যনিষ্ঠ-আদর্শবান-ব্যক্তি-স্বাধীনতাপ্রিয় চরিত্রের মধ্যে সমাপতিত করতে চেয়েছেন। মনসামঙ্গলের কবিকুল চাঁদসদাগরের পতনের জন্যে যেখানে মনসার প্রতি তার আনুগত্যহীনতা, জিদ (যাকে একগুঁয়েমি বলেছেন তাঁরা), অহংবোধ ইত্যাদিকে দায়ী করেছেন—সেখানে শম্ভু মিত্র চাঁদবণিকের পতনের জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির স্বৈরাচর, ব্যক্তি-স্বাধীনতাপ্রিয়-আদর্শবান চাঁদবণিকের আপোষহীন মনোভঙ্গিমাকে দায়ী করছেন। বস্তুত চাঁদবণিক আলোচ্য নাটকে এক নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্নে বিভোর। যে সমাজে গণতন্ত্রের কোনো মূল্য নেই, ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোনো স্বীকৃতি নেই, সেই স্থবির সমাজকে ভাঙতে ও নতুন করে গড়তে চেয়েছে শম্ভু মিত্রের চাঁদবণিক। এখানেই মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগরের সঙ্গে শম্ভু মিত্রের চাঁদবণিকের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়,—"ভাইরে, আমরা কি সেই নিডরিয়া বাপ-পিতেমহদের বংশের সন্তান?......প্রাণ দিয়্যা তারা নিজ প্রাণটারে সওদ্যা করেছে—আর আমরা কী করি? (হাঁক দিয়ে বলে) এ চম্পকনগরীর যত নিডরিয়া সদাগর ভাই,—সেই সব আত্মার তর্পণ আজ আমাদের কাজ। আমাদের পথ সত্য, চিন্তা সত্য, কর্ম সত্য। আমাদের জয় কেউ ঠেকাতি পারে না।"

চাঁদসদাগরের বাণিজ্যযাত্রা, আরাধ্য শিব ছাড়া মনসাকে পুজো না করার অটল ঘোষণা যেখানে মঙ্গলকাব্যের কবির কাছে নিছকই মূর্খামি ও গেঁয়ারতুমি,—সেখানে শম্ভু মিত্র চাঁদের এই আচরণকে বস্তুত একজন আদর্শবাদী আত্মবিশ্বাসী মানুষের সত্যনিষ্ঠা হিসেবে চিহ্নিত করছেন। গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে আপোষকামিতায় জীবন কাটানো তো অত্যন্ত সহজকর্ম। কিন্তু তার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে চাঁদবণিকের উচ্চারণ যেন আধুনিককালের আদর্শবাদী ব্যক্তিস্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের সাহসী ঘোষণা,—"ভাইরে, দেশ তো এখন মনসার পূজারীরা কুক্ষিগত কর্‍্যে নেছে। সত্যকার দেশের অন্তর এখন তো খালি বেঁচ্যে আছে আমাদের বুকে।" এখানে লক্ষ্যণীয় 'দেশ' শব্দটি! মনসামঙ্গলে দেশ বা দেশের ভাবনা দেবী মনসার পুজোর মধ্যে সমাহিত। আধুনিক সময়ের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটকে শম্ভু মিত্র দেখতে চেয়েছেন চাঁদের জীবন সংকটে। দেবী মনসা তাই শম্ভু মিত্রের আলোচ্য নাটকে চরিত্র হিসেবে অনুপস্থিত। কেননা আধুনিককালে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি নেপথ্যে থেকে তার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আপন কর্তৃত্ব কায়েম রাখে। সেজন্য বেণীনন্দন বা আচার্য বল্লভ নানাভাবে চাঁদবণিকের বাণিজ্যযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করে। চাঁদবাণিকের বিরুদ্ধে গড়ে তোলে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র :—

"বল্লভ ॥—ও।—চন্দ্রধর সম্পর্কে তোমার মনোগত অভিপ্রায় কী?

বেণী ॥ (জিভকেটে)—আমার তো ব্যক্তিগত কোনো অভিপ্রায় থাকাই উচিত নয়, প্রভু। অভিপ্রায় শাসনবিধির। সে বিধির কাজ হোল, সমাজের যে আকার আছে তারে এক নিয়মের শৃঙ্খলে বেঁধে পরিপাটী করে রাখা। এই নিয়মভঙ্গের উচ্ছৃঙ্খল প্রবণতা কখনো তো কোনো সমাজেই প্রশ্রয় পেতে পারে নাক!"

আলোচ্য নাটকে চাঁদের একদা শিক্ষাগুরু আচার্য বল্লভের সময়ের স্রোতে মানসিক পরিবর্তনটুকু একান্তভাবে লক্ষ্যণীয়—"অর্থহীন জীবনের এই কালীদহে শুধু যেন ঘূর্ণাচক্র ঘোরে। সেই চক্রে সূর্য বলো, চন্দ্র বলো, তারা বলো, সব যেন বুদ্বুদের মতো মুহূর্তেই লুপ্ত হয়্যা যায়। সত্য শুধু অন্ধকার, 'মনসার সর্পিল আন্ধার!" আচার্য বল্লভের এই

উচ্চারণ যে অনন্যোপায় আত্মসমর্পণ তাই শুধু নয়, চাঁদবণিকের শিক্ষাগুরুর এই আপোষ চাঁদবণিকের লড়াইকে আরো কঠিন করে তোলে। শুধু তাই নয়, চাঁদবণিকের সহধর্মিনী, স্ত্রী সনকা-ও আদর্শগতভাবে চাঁদবণিকের থেকে বেশ কিছুটা দূরে। সনকাকে মনসামঙ্গালের ঘেরাটোপের বাইরে টেনে এনেছেন শম্ভু মিত্র। তাই মেঘনাদবধকাব্যের চিত্রাঙ্গাদা-র মতই সনকা আপন সংসারের মঙ্গলার্থে যা খুশি বলতে পারে, করতে পারে,—"সদাগর, তুমি ভালো কর‍্যে বিবেচনা করো—জীবনের সব অর্থ গণনায় কই পাওয়া যায়? দিনমানে যে আলোক দেখি, সেইট্যা তো জীবনের একমাত্র সত্য নয়!" আবার লখিন্দর আধুনিক সময়ের যুবকের মতই পিতাকে প্রথমদিকে অভিযুক্ত করেছে তীক্ষ্ণভাবে, "কেন তুমি এই পথ বেছ্যে নিয়েছিলে? ঘর পেলে? শান্তি পেলে? সমাজে সম্মান পেলে? উপরন্তু তোমার কারণে আমার মায়েরে কেন অপমান হতে হয়?" বাস্তবে চাঁদের এই সংকট, এহেন সর্বব্যাপ্ত প্রতিপক্ষ—এঁরা যেন মনসারই প্রতিনিধি আধুনিক সময়ে। এহেন সংকটে চাঁদের পাশে দাঁড়াবার মতোন কেউ নেই। চাঁদ নিঃসঙ্গ, শুধু আদর্শ আঁকড়ে থেকেছে,—যেমন থেকেছিলেন নাট্যকার শম্ভু মিত্র—জীবন সংকটের মধ্যে—একাকী, নিঃসঙ্গ।

মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের কাহিনি এখানে নিছক চাঁদের সংকটের কাহিনি নয়, স্বতন্ত্র চম্পকনগরীর কাহিনিমাত্র নয়,—আধুনিক সময়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সংকটরূপে চিহ্নিত, আধুনিক স্বার্থমগ্ন জীবনের কুটিল রাজনীতি পুরাণের আবহ অতিক্রম করে আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় মিলে যেতে চায়,—"আর চতুর্দিকে হাওয়ারও অবস্থা দেখ্যা—বেণীও বুঝ্যেছে, যে মানুষের অভিযানে বাধা দিতে নাই। বরঞ্চ সহায়তা করাটাই গদিরক্ষণের উচিত কর্তব্য। বুঝ্যেছ না?"। এমন পরিবেশে বেমানান চাঁদবণিককে তাই আচার্য বল্লভ বলতে পারে, "সে অনেক রাজনীতি চন্দ্রধর, তুমি তার হদিশ পাবে না।" আলোচ্য 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকটির আধুনিক রূপায়ণের ক্ষেত্রে নাট্যকার শম্ভু মিত্র এমনকিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছেন যা একান্তভাবেই সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গিমার প্রতিফলন, যেমন : চাঁদের পুনর্বার অভিযানে রাজনীতি, লখিন্দরের যাত্রার আয়োজন, বেহুলা-লখিন্দরের আত্মহত্যা, বিশ্বকর্মার পরিবর্তে তারাপতি কর্মকার।

৮.৫ চাঁদবণিকের পালা : তত্ত্বানুসন্ধান

শম্ভু মিত্রের 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকে চাঁদের সংকট, ক্রমিক পতন, হতাশার অন্ধকারে ক্রমশ ডুবে যাওয়া—এ সমস্তই ভয়ঙ্কর একাকীত্বের সূচক হয়ে দাঁড়ায়। 'শাশ্বত রাত্রির বুকে' চাঁদবণিক 'অনন্ত সূর্যোদয়ের' সাধনা করেছে। জীবনানন্দের মতোই চাঁদ যেন বলতে চায়, "একটি আলোক নিয়ে বসে থাকা চিরদিন

নদীর জলের মতো স্বচ্ছ এক প্রত্যাশাকে নিয়ে।" ('আবহমান' : জীবনানন্দ)।

চাঁদবণিকের অভিযান আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ, কিন্তু সেই ব্যর্থ অভিযানই অনুপ্রেরণা জোগাবে নতুন অভিযাত্রীদের—"পাড়ি দেও। এ আন্ধারে চম্পকনগরী তবু পাড়ি দেয় শিবের সন্ধানে।" চাঁদবণিকের অভিযানের ব্যর্থতা এই চম্পকনগরীর পতনের সীমানা নয়, ব্যাপকভাবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব একজন ব্যক্তিস্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে,—তাকেই স্পষ্ট করেছেন নাট্যকার শম্ভু মিত্র।

আমাদের মনে হয়, বাংলা নাটকে 'চাঁদবণিকের পালা'-র প্রাসঙ্গিকতা বিচারে তত্ত্বগত বাধা একটি বড় বাধা। তবু এই নাটকের তত্ত্বানুসন্ধানেই নাটকটির শিল্পকর্মের সার্থকতা খুঁজে নেওয়া সম্ভব। কেননা আপাত বিরোধিতার বা আপাত অসঙ্গাতির ফলে যে বিচিত্র সংকটপূর্ণ বাস্তবতা শিল্পকর্মে স্পষ্ট হয়, তত্ত্বের পথ ধরে তাকে সহজে ধরা যায়। যদিও শিল্প থেকে তত্ত্বেও, আবার সেখান থেকে শিল্পে ফিরে যাওয়া যেকোনো শিল্পকর্মবিচারে চট্-জলদি পথ হিসেবে চিহ্নিত হয়। বস্তুত আলোচ্য 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকে এমনই চট্-জলদি পথের হাতছানি রয়েছে। কখনো বা মনে হয়, শিল্পের

যে জীবন তা অনেকটাই যেন সেই তত্ত্বের সঙ্গতিতে সজ্জিত।

আমরা দেখেছি চম্পকনগরীর ঐতিহ্য চাঁদ স্বীকার করেছে, আবার চম্পকনগরী স্বীকার করে নিয়েছে চাঁদবণিকের পতনের বর্তমানকে। আলোচ্য নাটকের তিনটি পর্বজুড়ে সেই পতনের ক্রমিক তীব্র বেগ-ই যেন নাটক হয়ে ওঠে।

৮.৬ চাঁদবণিকের পালা : চরিত্র বিচার

'চাঁদবণিকের পালা' নাটকটি চাঁদবণিক কেন্দ্রিক। নাট্যকার শম্ভু মিত্র আধুনিক সময়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে নিজস্ববোধ স্পষ্ট করতে গিয়ে চাঁদবণিক চরিত্রকে তাঁর নাটকের ভরকেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। অপরাপর চরিত্রগুলি চাঁদ চরিত্রকে উজ্জ্বলতর করার প্রক্রিয়ায় সামিল হয়েছে। নাট্যকার শম্ভু মিত্র আলোচ্য নাটকটির নামকরণের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাঁর নির্দিষ্ট লক্ষ্য, গন্তব্য।

চাঁদবণিক : 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকের সূচনাংশে চাঁদের একটি সংলাপের মধ্য দিয়ে চাঁদ চরিত্রের উন্মোচন,— "কিন্তুক, এটাও যেন ভাই, বেভ্‌ভুল না হয়, যে, আমাদের পথে হল দুরন্তর বাধা। সমাজে, সংসারে,—দেখো, সবায়েতো আমাদের খালি অপবাদ দিবে। আপন ঘরের লোকে, আত্মীয়স্বজনে, আমাদের খালি গালমন্দ দিবে। কেননা, তুমি যে শিবের ভজনা করো। যেটা সত্য মনে করো সেটারে যে তুমি মন খুল্যে সত্য বলো—এই ট্যাই অপরাধ।...... আমাদের পথ সত্য, চিন্তা সত্য, কর্ম সত্য, আমাদের জয় কেউ ঠেকাতি পারে না।" সততা ও নিষ্ঠাকে সম্বল করে সমুদ্রের বুকে পাড়ি দেবার সংকল্পে চাঁদবণিক এগিয়ে এসেছিল। চাঁদবণিকের স্বপ্ন ছিল তার ভাবনা নিশ্চয়ই বাস্তবায়িত হবে। আলোচ্য নাটকের ঘটনা পরম্পরায় আমরা লক্ষ্য করি যে চাঁদবণিকের স্বপ্নপূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় দেবী মনসা,—আধুনিক সময়ের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিরূপে সবার অলক্ষ্যে মনসা চাঁদের অভিযান ব্যর্থ করে দিতে চায়। কারণ? কারণ এই, চাঁদবণিক শিবের ভজনা করে। কিন্তু মনসার সর্বাতিশয়ী আধিপত্যে চাঁদবাণিকের আনুগত্যহীনতা মনসা সহ্য করতে পারে না। এরই নাম বুঝিবা ক্ষমতায় অন্ধ স্বৈরাচার! তাই ব্যক্তিগত আরাধনায় চাঁদের ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকারে রাজি নয় মনসা ও তার দলবল। ক্ষমতার প্রতাপে অন্ধ মনসা ও তার দলবল চাঁদকে ধনে-প্রাণে শেষ করতে চায়। শুরু হয়ে যায় চাঁদবণিকের কঠিন লড়াই। হীন, ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার চাঁদবণিক একে একে হারাতে থাকে অভিযানসঙ্গী, পরিবার, অস্তিত্ব রক্ষার বাস্তবভূমি!

চাঁদবণিক যেহেতু সত্যনিষ্ঠ, তাই সে মানতে পারে না যে সত্য পরাজিত হবে,—"মিথ্যা যতোই প্রতাপশালী হোক, তবু সে ভঙ্গুর, অবশেষে সত্য জয়ী হয়? জীবনে সত্যের জয় অবশ্য নিশ্চিত?" চাঁদবণিকের এই ভাবনার উত্তরে আচার্য বল্লভ (যিনি চাঁদের শিক্ষাগুরু) অবস্থার চাপে যিনি বদলে গেছেন, তিনি উত্তর দেন,—"ভুল, ভুল, মহাভুল,—......ইতিহাস খুল্যে দেখো, অবশেষে চিরকাল মিথ্যা জয়ী হয়্যা এল। রামচন্দ্র জানকীরে উদ্ধারের লেগ্যে পুণ্যযুদ্ধ করে, কিন্তু, সে জয় তো সাময়িক। প্রজাদের মিথ্যা কুৎসা শুন্যা গর্ভবতী পত্নীট্যয়রে পুনরায় বনবাসে দিতে হয়। সেই হোল অবশেষে। কার জয় হয়? সেই অবশেষে?" একদা শিক্ষাগুরু আচার্য বল্লভের এই কথায় চাঁদ বড় কষ্ট পায়। চাঁদ গভীর মনোবেদনায় লক্ষ্য করে কীভাবে 'আমাদের মানুষিতা নষ্ট হয়্যা যায়'। মনুষত্ব নষ্ট হবার ইতিবৃত্তে আচার্য বল্লভের সংযোজন চাঁদকে এক অন্যতর অনুভবে পৌঁছে দেয়। চাঁদ অনুভব করে যে এমন এক সময় উপস্থিত হয়েছে যেখানে জ্ঞানের সম্মান নেই, সুভদ্র মানুষ নেই, আপন স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা মানুষের নেই। সেই কারণেই নাটকের প্রথমদিকে চাঁদের সন্তান লখিন্দরও অভিযোগ করে,—"নাটুয়ার মতো রাজা সেজ্যে ভেব্যেছিলে সত্য বুঝি রাজা হয়্যা গেছ"!

কিন্তু যাবতীয় সততা, সাহস, পরিশ্রম সত্ত্বেও চাঁদবণিক ক্রমাগত বিপর্যস্ত হতে হতে শেষপর্যন্ত মিথ্যার কাছে, যুক্তিহীনতার কাছে, ক্ষমতার প্রতাপের কাছে অনন্যোপায় আপোষ করতে বাধ্য হয়েছে,—"আমি পূজা দিব। পূজা দিব। জানিনে তো সে মানুষ আছি কী না। তবু পূজা দিব।" অবশেষে বাধ্য হয়ে চাঁদবণিক মনসার পুজো দেয়। পুজো দিতে হয়। সর্বগ্রাসী ক্ষমতালোলুপতার কাছে হার মানে সৎ, পরিশ্রমী, সাহসী ব্যক্তি চাঁদবণিক!!

সনকা ও বেহুলা

শম্ভু মিত্রের 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকের দুই নারী চরিত্র সনকাও বেহুলা ব্যক্তিগত সম্পর্কে শাশুড়ী-পুত্রবধূ হলেও জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিমায় একেবারে বিপ্রতীপ অবস্থানে নাট্য অভিপ্রায় সিদ্ধ করেছে!

সনকা চাঁদবণিকের স্ত্রী, লখিন্দরের মা, বেহুলার শাশুড়ী। ভারতীয় গৃহবধূর দৈনন্দিন আচার-আচরণের সর্বোত্তম প্রকাশে সনকা এখানে অকুণ্ঠ। চাঁদের আদর্শ, সততা, অভিযান ইত্যাদি কোনোকিছুতেই সনকার ব্যক্তিজীবনকে প্রভাবিত করেনি। সংসারের মঙ্গলকামনায়, পরিবারের কল্যাণে যেকোনোরকম আপোষে বিশ্বাসী সনকা। এখানেই স্বামী চাঁদবণিকের সাথে তার ঠাণ্ডা লড়াই। চাঁদবণিক চায় যে তার সহধর্মিণী অন্তত তার আদর্শের সম্মান করুক, তার তীব্র কঠিন লড়াইয়ে সামিল হোক। কিন্তু তা তো হবার নয়। চাঁদের মতোন চিন্তার উচ্চক্ষমতা, আদর্শে অটল থাকার তীব্র সহ্যশক্তি, সততায় অকুণ্ঠ থাকার মানসিক জোর সনকার নেই। তাই সনকার একমাত্র কামনা—

"এ গৃহে কল্যাণ হোক, পাপ দূর হোক।
সর্ববিধ অমঙ্গল দূরীভূত হোক॥
স্বামীর মঙ্গল হোক, পুত্রের মঙ্গল।
লক্ষ্মীর প্রসাদে যাক সর্ব অমঙ্গল॥"

এমনকি মনসার পুজো করতে নারাজ স্বামী চাঁদবণিকের প্রতি সনকার ক্ষোভ সনকা আপন ভাষায় অকুণ্ঠ চিত্তে ব্যক্ত করেছে—"......আগুকার কথা হোল তুমি অহঙ্কারী। আপনার অহঙ্কার তোষণের তরে তুমি লড়াই কর্যেছ। শিব সেথা উপলক্ষ্য মাত্র।" বস্তুত, চাঁদের কারণে সনকার পরিবার যে বিপন্ন এই বাস্তব সত্য সনকাকে কখনো কখনো সম্পূর্ণভাবে স্বামীবিরোধী অবস্থান নিতে সাহায্য করেছে। সনকার ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন এই যে তার সংসার যেন অটুট থাকে, মঙ্গল ও শান্তি যেন সর্বদা সংসারে থাকে। তাই স্বামীর জীবনদর্শন সনকার কাছে নিছকই চাঁদের অযথা অহঙ্কারের ক্ষেত্রমাত্র,—"......পত্নী বলো, পুত্র বলো, তোমার সংসার বলো,—সকলেরে সর্বদা তুমি তোমার গর্বের যূপকোষ্ঠে বলি দিয়্যা পাড়ি দিতে গেছ।" অথবা, "......আদর্শ নিষ্ঠার অন্তরালে যে-মানুষ আছে, সেটা ওই অহঙ্কারী কুচরিত্র চাঁদসদাগর।"

বস্তুত চাঁদের লড়াই কঠিন থেকে কঠিনতর হয়েছে ঘরের প্রতিবন্ধকতায়, সনকার বিরোধিতায়। কিন্তু লখিন্দর ও বেহুলার আত্মাহুতির পর সনকা যখন সম্পূর্ণ একা হয়ে যায়, তখন তার কণ্ঠস্বরে সংসার বাঁচানোর প্রাণান্তকর ব্যর্থ চেষ্টার ক্লান্ত সুর শোনা যায়,—"......হায়, একী হোল সদাগর! তুমি শিবভক্ত, শিবপূজ্যা কর্যা গেছ;—আমি তোমার বিরুদ্ধে মনসার পূজ্যা কর্যা গিছি—শত্রু পরস্পর! তবু দেখ আজ দুজনাই বস্যা আছি অসার্থক জীবনের শটিত জঞ্জাল নিয়্যা। কেন ওই পরিণতি হোল সদাগর? তাইলে কি জীবনে কোথাও কোনো সত্য নাই?......এট্টা কিছু কও সদাগর। তুমি ছাড়া আর আমার কেউ তো এখন নাই।"

অন্যদিকে বেহুলা যেন আধুনিক সময়ের প্রতিনিধি। বস্তুত এক সর্বব্যাপী আশ্বাসহীন, বিশ্বাসহীন ভয়ঙ্কর অন্ধকারে স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিমূর্তিরূপে চাঁদের যে ধ্বংসচিত্র আলোচ্য নাটকে চিত্রিত, সেখানে বেহুলা চরিত্রের উপস্থিতি যেন এই বাক্য উচ্চারণ করে, "জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো"। মনসামঙ্গলের আবহ থেকে সম্পূর্ণ

স্বতন্ত্র ভঙ্গিমাতে উপস্থিত বেহুলা। তাই বেহুলা আলোচ্য 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকে নিছক লখিন্দরের স্ত্রী অথবা চাঁদবণিকের পুত্রবধূ হিসেবে উজ্জ্বল নয়। মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলা যেখানে একমাত্রিক স্থিরকলা ভারতীয় আদর্শে পতিব্রতা নারীর পরিচয়ে অবগুণ্ঠিতা হিসেবে আমাদের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়,—সেখানে আমাদের আলোচ্য 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকের বেহুলা যেন আধুনিক সময়ের চিন্তা-ভাবনা সমৃদ্ধ উচ্চকণ্ঠ এক আধুনিক নারী। এক নিতান্ত আটপৌরে মধ্যবিত্ত পরিবারের শান্তিপূর্ণ জীবনের মধ্যমণি ছিল যে বেহুলা,—সে চাঁদবণিকের সংকটপূর্ণ জটিল ঘূর্ণাবর্তের সংসারে এসে নিজস্ব বিচারবোধের দ্বারা চালিত হয়েছে।

সেই কারণে বেহুলাকে বেহুলার শাশুড়ী সনকা যখন প্রাণাধিক লখিন্দরকে পিতার পথ অনুসরণে নিবৃত্ত করার আপ্রাণ চেষ্টায় বলে, "...এই বেরে পিতা তার যতো চেষ্টা পাক, লখাই তো আর কভু পাটনে যাবে না।—আজ রাতে এই কথা বুঝ্যায়ে সম্মত করো স্বামীরে তোমার। প্রতিজ্ঞা কর্যাবে—সর্বদা তোমারে যেন নিকটে-নিকটে রাখে।"—তখন বেহুলা উত্তর দে,—"কিন্তুক, চাঁদবণিকের বংশধরে আমি পাড়ি দেওনের পথে কেমনে মা বাধা দিব? সেইট্যা তো অন্যায় হবে।" বেহুলার এহেন উচ্চারণ যে পক্ষান্তরে চাঁদবণিকের লড়াইয়ের প্রতি তার সমর্থন ঘোষণা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আলোচ্য 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকে চাঁদবণিক পাড়ি দিয়েছিল।—কিন্তু 'বহর' নিয়ে ফিরতে পারেনি। লখিন্দর তো পাড়ি দিতেই পারে না। শুধুমাত্র এক বালিকাবধূ, যার নাম বেহুলা, যার কপালে বাসরের সিঁদুর, সে কলার মান্দাসে পাড়ি দেয় এক অমোঘ-আত্মবিশ্বাসী উচ্চারণে,—

"স্বামীরে সঙ্গাতি লয়্যা ত্রিকাল জাগর হয়্যা—
জীয়নের মন্ত্র খুঁজে ফিরিবে অন্তর।
খুঁজিব কোথায়, কবে, এ বিষ নামিয়া যাবে
একেবারে সুস্থ হবে স্বামীর শিয়র।"

অবশেষে সেই বালিকাবধূ বিজয়িনী হয়ে চম্পকনগরীতে ফিরে আসে। যে জয়ের অভাবে চাঁদবণিক 'ইতহাস' থেকে স্থলিত হয়েছিল চম্পকনগরীতে,—সেই জয় এই বালিকাবধূ বেহুলা তার নির্বাচনের অধিকারে তুচ্ছ করে দেয়। বেহুলা তার সৎ দ্বিধা ও সৎ লজ্জা নিয়ে চাঁদবণিকের কাছে তাই বলে, "কতো গর্ব কর্য়েছিনু মনে চাঁদবণিকের মতো বিরাট মানুষ আমার শ্বশুর হবে। আর তোমারি এ চিরজীবনের অটল প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গ্যায়েছি আমি। জীবনেতে কোন পথে চল্যা কোথায় যে পৌঁছ্যায় মানুষ (আবার কাঁদে)। শেষপর্যন্ত লখিন্দরের সাথে একযোগে বিষপানে বেহুলার আত্মবিসর্জন এ নাটকে সবচাইতে চমকপ্রদ ঘটনা। আত্মবিসর্জনের অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বেহুলা যেন তার শ্বশুরের ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে অন্যমাত্রায় পৌঁছে দেয়।

লখিন্দর : আমরা 'মনসামঙ্গাল' কাব্যে লখিন্দর চরিত্রের যে উপস্থিতি লক্ষ্য করি, তা নেহাৎ-ই নগণ্য। সেখানে লখিন্দর চাঁদবণিকের পারিবারিক বৃত্তের অন্তর্গত যেন এক উপেক্ষিত চরিত্র। এই চরিত্রের সেখানে কোনো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, ব্যক্তিপরিচয় তেমনভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। আসলে 'মনসামঙ্গাল' কাব্যে লখিন্দর যেন এক বৃহত্তর অভিপ্রায় পূরণে 'উপলক্ষ্য' মাত্র। সেখানে লখিন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু ও বেহুলার দ্বারা কলার মান্দাসে ভেসে যাওয়া এটুকু ছাড়া লখিন্দরের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের কোনো আলাদা পরিচয় নেই।

কিন্তু আলোচ্য 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকে লখিন্দর চরিত্রকে সম্পূর্ণ অন্য মাত্রা দান করেছেন নাট্যকার শম্ভু মিত্র। লখিন্দর চরিত্রের ক্রমিক বিবর্তন ও পরিণতি লক্ষ্য করার মতো। সনকা চাঁদবণিকের প্রবল আদর্শনিষ্ঠতাকে সংসারের খাতিরে যেমন মেনে নিতে পারেনি, তেমনই প্রথমদিকে লখিন্দর তার পিতার কর্মকাণ্ডকে নিছক এক ব্যক্তির আপন

গোঁয়ার্তুমি হিসেবেই দেখেছিল। তাই সে পিতা চাঁদবণিককে প্রশ্ন করেছিল তীব্রভাবেই—"কেন তুমি এই পথ বেছ্যে নিয়্যেছিলে? ঘর পেলে? শান্তি পেলে? সমাজে সম্মান পেলে? উপরন্তু তোমার কারণে আমার মায়েরে কেন অপমান হতে হয়? মোরে কেন অপমান হতে হয়? তোমার এ উন্মত্ত আদর্শের দায়ে আমাদের সহজে বাঁচ্যার পথ কেন রুদ্ধ হয়?......"। লখিন্দরের এই উক্তি থেকেই প্রমাণিত যে প্রথমদিকে সে নিছক 'মায়ের ছেলে' হিসেবে আর পাঁচটা সাধারণ ছেলের মতোই পারিবারিক দুর্যোগে পিতাকে দায়ী করেছে। তাই লখিন্দরের উপরোক্ত অভিযোগের জবাবে যখন চাঁদবণিক বলতে চায়,—"...... লখিন্দর! অপরাধবোধ ঢোকাসনে অন্তরে আমার। তাইলে আমার সব শক্তি ভেঙে যাবে। আমি কোনো অপরাধ করি নাই।" পিতার এই জবাবে তখনও সন্তুষ্ট হয় না লখিন্দর। সে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আঙুল তুলে প্রত্যেকটা কথাকে বিশিষ্ট করার মতো করে বলে—"নিজেরে যে মানুষের চায়্যা কিঞ্চিৎ বিরাট-আকৃতি বল্যে মনে কর্যেছিলে এই অপরাধ। নাটুয়ার মতো রাজা সেজ্যে ভেব্যেছিলে সত্য বুঝি রাজা হয়্যা গেছ,—বিষ্ঠার ঢিবিতে খাড়া হয়্যা ভেব্যেছিলে ডিঙ্গি মেরে বুঝি আকাশটা ছুঁয়ে দেয়া যায়,—এই অপরাধ।......এ তোমার পাপ। বুঝ্যেছ কি?—বোঝো আর নাই বোঝো, মানো বা না মানো, আমাদের সর্বনাশে দায়িত্ব তোমার। (ক্ষুব্ধ ব্যঙ্গে) হে পিতৃপুরুষ, তোমার এ আত্মঘাতী যজ্ঞের বহ্নিতে আমরা আহুতিমাত্র তোমার ও কৃতাঞ্জলিপুটে।"

পারিবারিক বিপর্যয়ে লখিন্দর যে কতটা বিপর্যস্ত তা তার উক্ত বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি। এই লখিন্দর পিতার আজ্ঞাবহ মধ্যযুগীয় পুত্র সন্তান নয়। আধুনিক সময়ের সন্তান। তাই পিতার কারণে সংসারে যে বিপর্যয় তা পিতাকে সরাসরি জানাতে লখিন্দরের কোনো দ্বিধা নেই। নাট্যকার শম্ভু মিত্র অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই পুত্র লখিন্দরের ক্ষোভের প্রকাশ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ লখিন্দর চরিত্রটি প্রথমাবধি ছাঁচে ঢালা চরিত্র নয়। তাই চরিত্রটির বিবর্তন লক্ষ্য করার মতো। ক্রমশ কালের অমোঘ নিয়মে লখিন্দর অনুভব করে যে পরিস্থিতির জন্য পিতাকে একা দায়ী করা ভুল হচ্ছে। পরিবারে-প্রতিবেশে-দেশে যে অদ্ভুত আঁধার নেমে এসেছে তার জন্যে তার পিতা দায়ী নয়। বরং পিতাও এই আঁধারের শিকার, তাই তিমিরবিনাশী হতে চেয়ে পিতা চাঁদবণিক পাড়ি দিতে চায়। লখিন্দর বুঝতে পারে যে তার পিতা চাঁদবণিক নিজ আদর্শে অবিচল থেকে পাড়ি দিতে চায় এটাই তার একমাত্র অপরাধ! তাই লখিন্দরের অকপট 'কনফেসন্' বা স্বীকারোক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,—"আমারে মার্জনা কোরো। অকারণ বহু কটুকথা কয়্যেছি তোমারে। এতোদিন শুধু অপরে কী করে নাই তাই নিয়্যা অভিযোগ কর্যা গেছি। ব্যঙ্গ কর্যা কয়্যেছি যে, পিতৃপুরুষেরা অদ্ভুত পৃথিবী এক রেখ্যে গেছে আমাদের তরে।......তুমি পুনর্বার পাড়ি দেও পিতা।"

'চাঁদবণিকের পালা' নাটকের দ্বিতীয়পর্বের শেষ দৃশ্যটি পিতা-পুত্রের আবেগঘন সংলাপে, আন্তরিক উচ্চারণে একেবারে অন্যতর। এখানেই মনসামঙ্গল কাব্যের লখিন্দর চরিত্রের তুলনায় আলাদা হয়ে যায় আমাদের আলোচ্য 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকের লখিন্দর চরিত্র। তাই তাকে আমরা বলতে শুনি,—"পিতা,—আশৈশব কল্পনার পিতা তুমি,—বীর পিতা,—ধন্য লখিন্দর তুমি তার পিতা,—পাড়ি দেও পিতা। আমি অনুচর হয়্যা সাথে সাথে যাব। আমারে তোমার অনুচর কর্যা নেও পিতা।" এই উক্তিতেই লখিন্দর হয়ে ওঠে সবার্থেই আধুনিক সময়ের পুত্র সন্তান। যুক্তির কষ্টিপাথরে পিতা চাঁদবণিকের কার্যক্রম বিশ্লেষণে লখিন্দরের কাছে এই সত্য ধরা পড়ে যে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির (এখানে মনসা) অন্যায় আচরণে পিতা চাঁদবণিক প্রতিস্পর্ধী শক্তি হিসেবে বিরোধী হওয়ায় এই দুর্ভোগ। আধুনিক চিন্তার স্বচ্ছতায় লখিন্দরের কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যায় পিতার আদর্শায়িত পথ ও মনসার প্রতিবন্ধকতা। এরপরেই আলোচ্য নাটকে লখিন্দর-বেহুলার বাসরঘরের দৃশ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। লখিন্দর তার বাসরশয্যায় নববধূর পাশে শুয়ে যে কথা উচ্চারণ করে, তা ক্রমশ আলোচ্য নাটকে লখিন্দরের জীবনে ধ্রুবপদ হোয়ে দাঁড়ায়,— "......জানো না কি চারিদিকে কতো হিংসা, কতো লোভ,—তুমি জানো না বেহুলা, জীবনের প্রতিযোগিতায় পদে-পদে এতো দ্বন্দ্ব, এতো গ্লানি, এতো কুটিলতা,—পৃথিবীর বুক থিক্যা এরা যেন 'প্রেম' অনুভবট্যারে নষ্ট কর্যে দিতি বদ্ধপরিকর। ঠিক। এবার বুঝ্যেছি আমি।

ইয়াদের সাথে ইয়াদের রণনীতি অনুসারে যুদ্ধ কর্য়ে জয়লাভ করণের আশাটাই ভ্রান্তপথ। তাতেই প্রথমে প্রেমট্যারে বলি দিতি হয়। কেননা যে জয়ী হতে হবে। যেকোনো উপায়ে তখন তো জয়লাভ করাটাই প্রধান কর্তব্য হয়। এইট্যাই ভ্রান্তপথ"। লখিন্দরের এই উক্তি গভীরতার জীবনবোধের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়! আলোচ্য নাটকে যে সংঘাতকে কেন্দ্র করে নাট্য কাহিনির বিস্তার। তাকে যেন চিহ্নিত করে দেয় লখিন্দর।

অতপর বাসরঘরে সর্পদংশনে লখিন্দরের মৃত্যু। মৃত লখিন্দরকে নিয়ে কলার ভেলায় বেহুলার যাত্রা, দেবদেবীদের সন্তুষ্ট করে লখিন্দরের প্রাণ নিয়ে বেহুলার ফিরে আসা এসবই মনসামঙ্গল সূত্রে আমাদের অত্যন্ত পরিচিত ঘটনা। কিন্তু যে ঘটনা আমাদের জ্ঞানের অতীত তা হলো নতুন জীবন নিয়ে ফিরে আসা লখিন্দরের অন্যতর অনুভবের তীব্র প্রকাশ—"......আমারি কারণে মোর পিতা মনসার পূজা দিল, তার পাছে সসম্মানে বেঁচ্যে রব আমি? মনসার দোরে যায়্যা অসম্মানে ভিক্ষা কর্য়া তুমি ব্যাঁচালে আমারে, ...বাসরের রাত্রে একবার মনে হয়্যেছিল দুইজনা মর্য়ে যাই। বেহুলারে, আজ সেই বাসরের রাত হোক।......কোন্ পরিচয় নিয়্যা লখিন্দর বেঁচ্যে রবে চাস তুই বল্?"

লখিন্দরের এই উক্তি এবং এর পরের ঘটনা নাট্যকার শম্ভু মিত্রের অনন্য সাধারণ ভাবনার প্রকাশ বলেই চিহ্নিত হয়। লখিন্দর তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আত্মহননে সামিল হয়। লখিন্দরের স্ত্রী বেহুলা-সহ আত্মহত্যা এক প্রবল প্রতিবাদ ও পিতার আদর্শে অটলভাবে নিজেকে ধরে রাখার আকুতি হিসেবে চিহ্নিত হয়।

অন্য একটি অপ্রধান চরিত্র : 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকে অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে নিজগুণে বল্লভাচার্যের চরিত্রটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় চরিত্র। বল্লভাচার্য একদা চাঁদবণিকের শিক্ষাগুরু ছিলেন। তাঁর প্রতি চাঁদবণিকের ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। সেই শিক্ষাগুরু বল্লভাচার্য শেষপর্যন্ত অনন্যোপায় আপোষ করেছেন অন্যায়ের সাথে, অনাদর্শের সাথে,—মনসার রাষ্ট্রশক্তির সাথে। এই কারণেই চরিত্রটির গুরুত্ব আছে। নাট্যকার আলোচ্য নাটকে এমন এক সময়ের কথা বলতে চান, যেসময়ে বল্লভাচার্যের মতো মানুষ গড্ডালিকাপ্রবাহে প্রবল শক্তিধরের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হয়। অন্যদিকে সেই প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি আপন কার্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে বল্লভাচার্যকে ব্যবহার করতে থাকে। তারই চমকপ্রদ নিদর্শন আলোচ্য নাটকের প্রথম পর্বে আমরা লক্ষ্য করি। এখানে বল্লভাচার্য রাজশক্তির প্রতিনিধিরূপে চাঁদবণিকের কাছে এসে বলেন,—"......চন্দ্রধর, এই অভিযান তুমি পরিত্যাগ করো।" তখন চাঁদ জবাবে বলে,—"কেন প্রভু? বেণীনন্দনের ডরে?" চাঁদবণিকের এই প্রশ্নের উত্তরে বল্লভাচার্য যা বলেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য,—"......বেণী নয় চন্দ্রধর, ঘটনার ডরে। জগতে এ যেন এক অন্ধকার অকাল নেম্যেছে, তারই ডরে। দেখোনা, জ্ঞানের সম্মান নাই, বিদ্যার মর্যাদা নাই, সুভদ্র আচার নাই, সুভাষণ নাই, মাংসসুখ ছাড়া অন্য কোনো সুখ-চিন্তা নাই,—ভুল্যে যাও, চন্দ্রধর, মহৎকার্যের কথা ভুল্যে যাও। শুধু কোনোমতে নিজেরে বাঁচেয়্যা রাখো। আদর্শের পাছে ছুট্যে কোনো লাভ নাই।"

বল্লভাচার্যের এই উক্তি এক লহমায় দেশ ও কালকে চিনিয়ে দেয়। বল্লভাচার্য আলোচ্য উক্তির মধ্য দিয়ে এই কথাই বলতে চান যে এক ভয়ঙ্কর সময় ও অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছেন সকলে। এহেন অবস্থায় কোনোক্রমে বেঁচে থাকা-ই মানুষের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।—বল্লভাচার্যের কাছেও আজ একটাই লক্ষ্য, তা হলো বেঁচে থাকা। এই কারণে আদর্শপ্রিয় চাঁদবণিক যখন বল্লভাচার্যের ঐ উক্তিতে বিস্মিত হয়ে গুরুদেবের এমন পরিবর্তন না মানতে পেরে বলে যে সবকিছু সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত জীবনে সত্যের জয় অবশ্য, নিশ্চিত। তখন কিন্তু বল্লভাচার্য যা বলে তা সত্যই কালের অভিঘাতে পরিবর্তিত এক মানুষের কণ্ঠস্বর বলেই বোধহয়,—"......ইতিহাস খুল্যে দেখো, অবশেষে চিরকাল মিথ্যা জয়ী হয়্যা এল।" শুধু তাই নয়, বল্লভাচার্যের এহেন অদ্ভুত পরিবর্তন যে পরিবারকে বাঁচানোর জন্যে সেকথার উল্লেখ করেন বল্লভাচার্য। বস্তুত বল্লভাচার্যের চরম দারিদ্র্য, প্রাণাধিক পুত্র সূর্যের অকালমৃত্যু, পত্নীর দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁকে রাজশক্তির সাথে অনন্যোপায় আপোষে বাধ্য করেছে। সেই কারণে নিজস্ব জীবনের উপলব্ধিতে বল্লভাচার্য বুঝেছেন যে তিনি ঘটনার দাসমাত্র, ঘটনা-ই নিয়তি। বল্লভাচার্যের এহেন নিরুপায় রূপান্তর যে বুকের ভিতরে বেদনার আগুন ধিকিধিকি জ্বালিয়ে

রেখেছে তার প্রমাণ পাই তাঁরই করুণ উচ্চারণে,—"......এ জীবন অর্থহীন। অর্থহীন জীবনের এই কালীদহে শুধু যেন ঘূর্ণাচক্র ঘোরে। সেই চক্রে সূর্য বলো, চন্দ্র বলো, তারা বলো, সব যেন বুদ্বুদের মতো মুহূর্তেই লুপ্ত হয়্যা যায়। সত্য শুধু অন্ধকার। মনসার সর্পিল আন্ধার। এই অভিযান তুমি ছেড়্যে দেও চন্দ্রধর, আদর্শের পাছে ছুট্যে কোনো লাভ নেই।"

বল্লভাচার্যের এহেন চরিত্রাঙ্কণে বস্তুত নাট্যকার আলোচ্য নাটকে চাঁদবণিকের লড়াই যে কতখানি দুর্বিষহ, কঠিন তা যেন চোখের সামনে জীবন্তভাবে দেখাতে চেয়েছেন। চাঁদের শিক্ষাগুরুর এহেন অনন্যোপায় পরিবর্তন সামাজিক পতনের করুণ চিত্রকেই উদ্‌ঘাটিত করেছে এখানে।

৮.৭ অনুশীলনী

১। 'চাঁদবণিকের পালা' নাটক কোন্ শ্রেণির রচনা?

২। চাঁদবণিকের পালা' নাটকে কোনো তত্ত্বভাবনা লুকিয়ে আছে কি? থাকলে তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।

৩। 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকটি মধ্যযুগের কাহিনি নির্ভর অথচ আধুনিক—আলোচনা করুন।

৪। 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকের নায়ক কে বিচার করুন।

৫। 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকের সনকা-বেহুলা দুই বিপরীত আদর্শের প্রতীক—আলোচনা করুন।

৬। 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকে নাট্যকার চাঁদ চরিত্রই শুধু নয়, অপ্রধান চরিত্র চিত্রণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।—আলোচনা করুন।

৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। নাট্যভাষ : শম্ভু মিত্র।

২। কাকে বলে নাট্যকলা : শম্ভু মিত্র।

৩। শম্ভু মিত্র : নির্মাণ ও সৃজন : কুমার রায়।

৪। বাংলা নাটকে রবীন্দ্রনাথ, গণনাট্য ও শম্ভু মিত্র : অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়।